Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও কয়েকজন চিত্রশিল্পী

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাসুদা খাতুন জুঁই
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.9
Pages	১৩৩-১৪৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও কয়েকজন চিত্রশিল্পী

Check for updates

মাসুদা খাতুন জুঁই*

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। এ মন্বন্তর ছিল সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরী। মানবতার স্খলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে শিল্পীরা ছবি এঁকেছিলেন। এ ছবিগুলি একদিকে বাংলার আধুনিক শিল্পচর্চার ধারবাহিকতার একটি পর্যায় হয়ে আছে অন্যদিকে তা হয়েছে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার প্রামাণ্য দলিল। শুধু চিত্রশিল্পে নয় সাহিত্যের মাধ্যমেও এ মর্মান্তিক ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে কয়েকজন শিল্পীর ছবি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাঁরা আদর্শগত দিক থেকে কিংবা সামাজিক দায়বোধের তাগিদে অথবা মানবিকতার বিপর্যয়ের প্রতিবাদে দুর্ভিক্ষ নিয়ে কিছু মূল্যবান শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

বিপুল সংখ্যক লোক মারা গিয়েছিল এই দুর্ভিক্ষে। শুধু তারা না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করেছিল। স্যার জন উডহেডের অধীনে তদন্ত কমিশন মৃতের সংখ্যা দিয়েছিল ১৫ লক্ষ। কিন্তু বেসরকারি গণনানুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। কমিশনের নিজস্ব গণনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে অমর্ত্য সেন প্রায় ৩০ লক্ষের হিসাব করেছেন। প্রায় সম্পূর্ণ মানুষের তৈরী এই বিপর্যয়ের গুরুত্ব এই কারণেও যে, এটি শুধু গ্রামীণ বাংলার অর্থনীতি ও জীবনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তাই নয়, এটি সামাজিক মূল্যবোধকেও বিপর্যস্ত করেছিল। (নীতিশ, ২০০৮ : ৩৬৭)

এই দুর্ভিক্ষ ভদ্রলোক শ্রেণিকে স্পর্শ করেনি। করেছিল সমাজের দরিদ্র শ্রেণিকে বিশেষত গ্রামীণ দরিদ্রদের। তারা গ্রামে নিজেদের বাঁচাবার জন্য কিছুই না পেয়ে খাদ্যের সন্ধানে বাধ্য হয়ে শহর ও শহরতলিতে এসেছিল। কেননা ওই সব জায়গায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ছিল, তাদের জন্য দোকানে যথেষ্ট খাদ্যও ছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দরিদ্রদের কিছুই ছিল না। তাদের খাদ্য ক্রয়ের জন্য অর্থ অথবা পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে অগ্রাহ্য করে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা করার মতো বৈপ্লবিক সাহস কোনোটাই ছিল না। হাজার হাজার গ্রামবাসী উপবাসে, নীরবে মৃত্যুবরণ করেছিল। (নীতিশ, ২০০৮ : ৩৭০)

মন্বন্তরের এই মানবিক বিপর্যয় শিল্পীদের তুলিতে করুণ রসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), চিত্তপ্রসাদ (১৯১৯-১৯৭৮), সোমনাথ হোর (১৯২১-২০০৬) প্রমুখ শিল্পীরা দুর্ভিক্ষকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন। দুর্ভিক্ষ শুধু তাদের ছবিতে বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থিত হয়নি, দুর্ভিক্ষের মানবিক বিপর্যয় তাঁদের শিল্পমানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই শিল্পীদের ছবির তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে নন্দনতত্ত্ব ও আদর্শগত কোন উত্তরাধিকারের মধ্যে থেকে তাঁরা দুর্ভিক্ষের ছবি নির্মাণ করেছিলেন তা জানা প্রয়োজন।

---

* প্রভাষক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লিখিত তিনজন শিল্পীর মধ্যে জয়নুল আবেদিন কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সোমনাথ হোর দুর্ভিক্ষের পরে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। চিত্তপ্রসাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা ছিলনা। জয়নুল আবেদিন ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৯২) তিনি ছিলেন এই স্কুলে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম বিদেশে শিল্পকলার মাধ্যম হিসাবে ছাপছবির করণকৌশল শেখেন ও আধুনিক চিত্রকলার সংস্পর্শে আসেন। (শোভন, ১৯৯৮ : ২৪৯) শিল্পী হিসাবে তিনি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে, প্রাচীনে ও আধুনিকতায় কোনো বিরোধে বিশ্বাস করতেন না। অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার বাঁধাধরা অন্ধ অনুকরণ না করে সৃজনধর্মী রচনার মাধ্যমে ছাত্রদের শিল্পী করে তুলবার প্রয়াসে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। এ লক্ষ্যেই তিনি সতীশচন্দ্র সিংহ (১৮৯৩-১৯৬৫), বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৬৮) মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৫-১৯৫৮), সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৭৭), অতুলচন্দ্র বসু (১৮৯৮-১৯৭৬) ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (১৯০২-১৯৫৫) মতো শিক্ষকদের সমবেত করেছিলেন। এসব শিক্ষক কেবল শিক্ষক হিসাবেই নয়, শিল্পী হিসাবেও সার্থক ছিলেন (শোভন, ১৯৮৮ : ২৬৪-২৬৫)। তাঁরই উদ্যোগে ছাপছবি চারুকলা বিভাগের মর্যাদা লাভ করে। ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং বিভাগের ছাত্ররা শুধুমাত্র কাব্যপুরাণ নিয়ে কাল্পনিক ছবি আঁকত। মুকুল দের আগ্রহে এই বিভাগের ছাত্ররা প্রত্যক্ষ জীবন-সম্পর্কিত ও নিসর্গ-বিষয়ক ছবি আঁকা শুরু করেন (শোভন, ১৯৯৮ : ২৬৫-২৬৭)। বস্তুত মুকুল দে অ্যাকাডেমিক আর্টের দুর্ভেদ্য দুর্গে সজীবতার যে আলোবাতাস বইয়েছিলেন তার ফলেই পরপর অনেক কৃতী শিল্পী এই আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়েছিলেন। মাধ্যমের স্বাধীনতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা দিয়ে আবার একই সঙ্গে উপস্থিতির কড়াকড়ি শৃঙ্খলার মাধ্যমে মুকুল দে আর্ট স্কুলে আলাদা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন (শোভন, ১৪০২ : ৯৩)।

তাঁর সময়ে শিক্ষিত পরিবারগুলি থেকে, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় থেকেই, অনেক ছাত্র এখানে ভর্তি হয় (শোভন, ১৯৯৮ : ২৬৭-২৬৮)। জয়নুল কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে জয়নুলের ছবির বিষয় ছিল প্রকৃতি ও মানুষ। কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কেচ করতেন। এছাড়াও সাঁওতাল পরগনার দুমকার প্রকৃতি ও আদিবাসী এবং ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা নিয়ে স্কেচ ও জলরঙে ছবি এঁকেছেন (আজিজুল, ২০০৪ : ১৪) টেকনিক হিসাবে অ্যাকাডেমিক স্বভাববাদিতার সাথে তাঁর ছবিতে মিশেছিল প্রতিচ্ছায়াবাদী ও সম্প্রকাশবাদী রীতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীন জাপানের শৈলী। ছাত্রজীবন থেকেই জয়নুলের ছবিতে ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্বভাবনিষ্ঠতা — যার মূলে ছিল সংবেদনশীল এক গভীর ঐহিকতা বোধ (শোভন, ১৪০২ : ৯৫) আর এই ঐহিকতাবোধের সঙ্গে মিশেছিল নিজের দেশের মাটির প্রতি টান। সম্ভবত এই মাটির টানের প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর শিক্ষক মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পদ্মানদী ও বাংলার গ্রাম জনপদকে বিষয় হিসেবে নিয়ে করা এচিং যা জয়নুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার ছাত্রজীবনে

(শোভন, ১৪০২ : ৯৪)। মুকুল দে নিজে ক্লাসে গিয়ে এচিং করতেন, ছবি আঁকতেন যাতে ছাত্ররা গুরুর কাজ দেখে উৎসাহিত হন (শোভন, ১৯৯৮ : ২০০)। জয়নুলের ছবির স্বাতন্ত্র্যধর্মী স্বভাববাদিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শোভন সোম বলেছেন—

> গ্রামবাংলার সাধারণ মুসলমান পরিবারের সন্তান জয়নুলের মধ্যে কাব্য পুরাণ- অতিকথার দায় ছিল না, ছিল না আভিজাত্যের ইতর ভেদের ব্যাপার। ... ঘরের পরিচয়, মাটির সংরাগ ছেড়ে তিনি ভৌগোলিক দূরত্বে অতীতের ধূসরতায় তাঁর আত্মাকে খোঁজেন নি। তাঁর ছবিতে যা প্রকাশিত হয় তা হল আবহমান বাংলা। (শোভন, ১৪০২ : ১১৯)

১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জয়নুলের ছবি আঁকার ধরন প্রায় একই ছিল। ময়মনসিংহের দৃশ্যাবলি, সাঁওতাল পরগনার দৃশ্যাবলি, প্রতিকৃতি প্রভৃতি বিষয় নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন (শোভন, ১৪০২ : ৯২)।

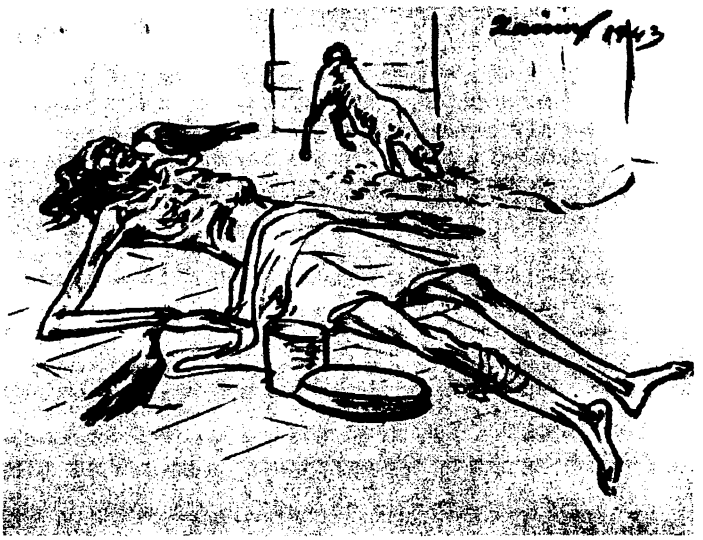

দুর্ভিক্ষ, কালি ও তুলি, জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৩

এপর জয়নুল আবেদিনের ছবিতে একটি বড় পরিবর্তন আসে '৪৩ সালেই। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ তাঁর শিল্প নির্মাণের ভাষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রান্তিক মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে শহরের রাস্তায় ভিড় জমায়, ক্ষুধায় মারা যায়, তখন জয়নুলের মনে গভীর দাগ কাটে। বাংলার সাধারণ মানুষের এ করুণ দশা তাঁর চিত্রপটে করুণ রসে মূর্ত হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো তাঁর ছবি আকার ধরনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। জয়নুল তাঁর স্বভাবনিষ্ঠ দৃশ্যাবলি অঙ্কন থেকে দুর্ভিক্ষের ছবিতে বাস্তবনিষ্ঠতার দিকে সরে আসেন (শোভন, ১৪০২ : ১০৭)। মানব শরীরের সরলীকৃত এবং দীর্ঘায়িত রূপ, আলোছায়াহীন কঠিন কর্কশ রেখা, দৃশ্যপট থেকে শুধু ফিগারকে তুলে এনে ফাঁকা পটভূমিতে বিন্যস্ত করা — সবকিছুর মধ্য দিয়ে মানুষের

করুণ অবস্থা এবং বাঁচার আকুতিকে অভিব্যক্তিপূর্ণ বাস্তববাদিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন জয়নুল।

জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি নানাভাবে নানা সমালোচক এবং ইতিহাসবেত্তাগণ মূল্যায়ন করেছেন। অবশ্যই তাঁর ছবির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং এর একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যায়। শিল্প ইতিহাসবেত্তা T. J. Clark-এর একটি মন্তব্য দিয়ে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবির তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে :

> The point is this : the encounter with history and its specific determination is made by the artist himself. The social history of art sets out to discover the general nature of the structures that he encounters willy-nilly; but it also wants to locate the specific conditions of one such meeting. How, in a particular case, a content of experience becomes a form, an event becomes an image, boredom becomes its representation, despair becomes spleen : these are the problems. And they lead us back to the idea that art is sometimes historically effective. The making of a work of art is one historical process among other acts, events, and structures – it is a series of actions in but also on history. It may become intelligible only within the context of given and imposed structures of meaning; but in its turn it can alter and at times disrupt these structures. A work of art may have ideology (in other words, those ideas, images, and values which are generally accepted, dominant) as its material, but it works that material; it gives it a new form and at certain moments that new form is in itself a subversion of ideology. (Clark, 1982 : 13)[১]

T. J. Clark যেমন বলেছেন — 'শিল্পী নিজেই ইতিহাসের মুখোমুখি হয় এবং একে সুনির্দিষ্টভাবে স্থিরীকরণ করে। শিল্পের সামাজিক ইতিহাসের লক্ষ্য হল, শিল্পী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে কাঠামোর মুখোমুখি হয় তার সাধারণ প্রকৃতি বা স্বরূপ উন্মোচন করা, কিন্তু এছাড়াও এ ধরনের অভিজ্ঞতার সুনির্দিষ্ট শর্তাবলিকে তা যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে চায়। কিভাবে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার একটি বিষয় আকারে বা রূপে পরিবর্তিত হয়, একটি ঘটনা প্রতিচ্ছবিতে পরিবর্তিত হয় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।' আমরা জানি, জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ নামক একটি কঠিন ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। এই ঘটনা ছিল মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা এবং অপমান যা প্রকৃতি দ্বারা নয় মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। জয়নুল এই অভিজ্ঞতার স্বরূপ উন্মোচন করতে চাইলেন শিল্পের মাধ্যমে। তাই দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা বা বিষয় রূপান্তরিত হল কিছু সুনির্দিষ্টরূপে এবং যে ভাবে বা যে প্রক্রিয়ায় তিনি এই ফর্ম তৈরী করলেন তা তাঁর পূর্ববর্তী দেখার অভিজ্ঞতা এবং ছবি সম্পাদন করার কৌশলে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। T. J. Clark যেমন আরো বলেছেন যে — 'আন্যান্য কর্মকাণ্ড, ঘটনা এবং কাঠামোর মধ্যে শিল্প নির্মাণ হলো একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া; এটি একটি ক্রিয়ার পরম্পরা যা ঘটে ইতিহাসের মধ্যে এবং ইতিহাসের বাইরেও। একটি প্রদত্ত এবং আরোপিত অর্থের কাঠামোর মধ্যে এটি বোধগম্য হতে পারে। কিন্তু পালাক্রমে এটা এই কাঠামোগুলোকে পরিবর্তিত করে এবং কখনো

কখনো ভেঙে দেয় বা ব্যাহত করে।' — একইভাবে জয়নুল বিষয়কে আগে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং চিত্রপটে নিয়ে আসতেন দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে গিয়ে সেই সুনির্দিষ্ট কাঠামোটিকে ভেঙে দিলেন, নতুন একটি কাঠামো তৈরি করলেন এবং এই কাঠামোটি নতুন একটি নন্দনভাবনায় রূপান্তরিত হলো। এই নন্দনভাবনটি শিল্পের ইতিহাসকে পরিবর্তিত করল। এই নতুন নন্দনভাবনাটি কী ছিল? দুর্ভিক্ষের ছবিতে জয়নুল কলকাতার রাস্তায় ক্ষুৎপীড়িত মানুষকে উপস্থাপনের সময় পারিপার্শ্বিকতার পুঙ্খনাপুঙ্খ বর্ণনা করেননি রঙে বা রেখায়। তাঁর দুর্ভিক্ষের চিত্রগুলো ছিল মূলত অবয়বের বহিঃরেখা-প্রধান। কিন্তু এই রেখা পূর্বের মতো সূক্ষ্ম বা কোমল ছিল না। ছিল অনেক বেশি জোরালো, কর্কশ এবং মোটা; অনেক ক্ষেত্রে শুকনো তুলির টানও দেখা যায়। এবং পুরো দৃশ্যপট জুড়ে থাকে মানুষের উপস্থিতি। ছবির কেন্দ্রবিন্দু এবং বিষয় — সবটাই মানুষ। যেন সমগ্র ইতিহাস, ঘটনা এবং কার্যকারণ এই মানুষের দেহ এবং ভঙ্গি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। মানুষের অনুষঙ্গ হয়েছে কাক এবং কুকুর। মনুষ্য শরীরের চারপাশে যে ফাঁকা বা শূন্য ঋণাত্মক জমিন তা মনুষ্যরূপ বা ধনাত্মক জমিনকে তীব্রতর করেছে। ছবিতে মানুষ, কাক, কুকুরের রূপ, ভঙ্গি এবং ডাস্টবিন, ফুটপাত, বাতিস্তম্ভ, লাঠি, ভিক্ষাপাত্র, গাছ, দেয়াল ইত্যাদির ইঙ্গিতপূর্ণ রেখা মিলে জটিল এবং দৃঢ় বিন্যাস তৈরি হয়েছে। যেমন একটি দৃশ্যে মৃত একটি মানুষ পটের বিস্তারে তির্যকভাবে পড়ে আছে, তারই পাশে উল্লম্ব ডাস্টবিন, বর্তুলাকার পাত্র, বিপরীতে তির্যক রেখায় কাকের সংস্থাপন মিলে বিভিন্ন ভঙ্গির টানাপড়েনে একটি মজবুত রৈখিক বৈচিত্র্য ও বিন্যাস তৈরী হয়েছে (শোভন, ১৪০২ : ১০০)। একটি অদৃশ্য এবং বিমূর্ত দ্বন্দ্ব জয়নুলের দুর্ভিক্ষ-চিত্রে বিদ্যমান যা সৃষ্ট হয় বিভিন্ন গতির রেখার মধ্য দিয়ে। রূপের ও আকারের এই দ্বান্দ্বিক জটিলতার কারণে ছবিগুলো অনেক বেশি বুদ্ধিনির্ভর। তাই বলা যায়, জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো মানুষের করুণ অবস্থার আবেগি নিবন্ধন ছিল না, ছিল পরিকল্পনামাফিক একটি দৃঢ় বিন্যাসে তৈরী। এই গুণটি জয়নুলের পূর্ববর্তী প্রায় সব ছবিতেই অনুপস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, এর আগে তাঁর আঁকা অন্যান্য ছবির মতো এগুলো সরেজমিনে অনুশীলনকালে পরিসমাপ্ত না হয়ে প্রত্যক্ষ অনুশীলনকে ভিত্তি করে স্টুডিওতে বসে দ্বিতীয় দফায় পরিকল্পিতভাবে আঁকা হয়েছে (নিসার, ২০০৭ : ২৭৭)। কিন্তু হঠাৎ করে এই জটিল বিন্যাস তিনি কোথায় শিখলেন। এটা তার শেখার ব্যাপার ছিল না। ছিল সিদ্ধান্ত, তিনি দুর্ভিক্ষের মতো বড় ঐতিহাসিক ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই সত্যকে তার উপযোগী বাস্তব রূপ দিতে হবে। তার এই সিদ্ধান্তই তাকে নতুন ভাষা তৈরীতে সহায়তা করল এবং পূর্বতন ভাষাকে নাকচ করে দিল। জয়নুলের ছবির এই অভিব্যক্তিবাদী বাস্তবতা তাকে অ্যাকাডেমিক শিক্ষার গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে এল। তাঁর পরবর্তী অনেক ছবিতে দুর্ভিক্ষের ছবির গুণাগুণ উপস্থিত। পরিমিতিবোধ, গতিময় ও ক্ষিপ্র তুলির টান, ধনাত্মক জমিন ও ঋণাত্মক জমিন উভয়ের গুরুত্ব, পরস্পরবিরোধী গতির দ্বন্দ্ব — এসব গুণ পরবর্তী অনেক ছবি যেমন 'বিদ্রোহী', 'গুণটানা', 'মই দেয়া' এবং বিশেষ করে 'নবান্ন' ও 'মনপুরা ৭০' শীর্ষক ছবিতে উপস্থিত। বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষকে প্রাধান্য দেয়া এবং ছবির জমিন জুড়ে মানুষের উপস্থিতি পরবর্তী অনেক ছবিতে বিদ্যমান।

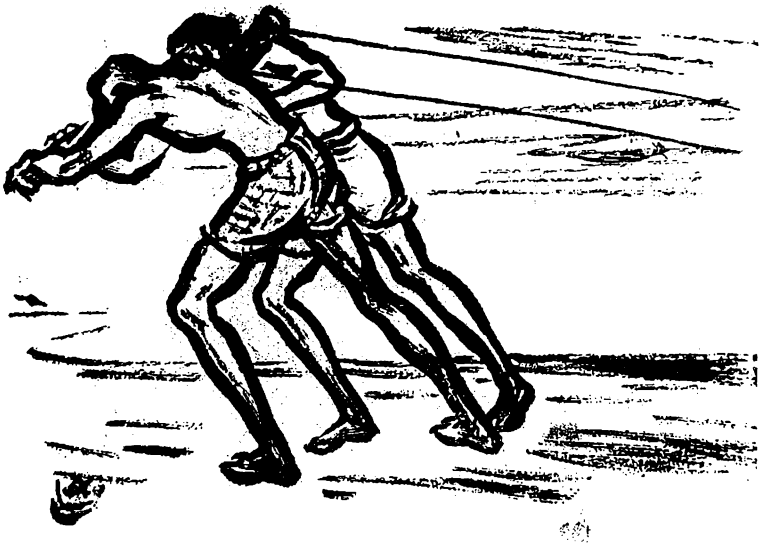

গুনটানা, কালি ও তুলি, জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৮

বিদ্রোহী, জল রং, জয়নুল আবেদিন, ১৯৫১

T. J. Clark-এর তত্ত্বটি জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবির ব্যাখ্যায় যেমন প্রযোজ্য তেমনি তা সহায়ক দুর্ভিক্ষের আর এক রূপকার সোমনাথ হোরের চিত্র বিশ্লেষণে। দুর্ভিক্ষের

ক্ষত সোমনাথ হোরের সমগ্র শিল্পের বিষয় ও প্রকরণ উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। তাঁর ভাষায় —

> দিল্লিতে থাকাকালে আমি বিষয়কে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বিষয় আমাকে ছাড়েনি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে ক্ষত, যুদ্ধের যে অমানবিকতা, ছেচল্লিশের দাঙ্গার বীভৎসতা — এগুলি আমার আঁকার পদ্ধতিতে খোদিত হয়ে যাচ্ছিল, আমারই অজানিতে। কাঠ-খোদাইয়ের নরুণ দিয়ে কাঠ কাটি, ধাতুতলে অ্যাসিড দিয়ে ক্ষত তৈরি করি, আগে থেকে কোনো প্রাথমিক খসড়া ছাড়াই এই কাটাকুটির কাজ চলে, পরে অসংখ্য ক্ষত একটি মাত্র বিষয়ের ইঙ্গিত বয়ে আনে; তা হল আমাদের চারিপাশে যারা অসহায়, পরিত্যক্ত, নিরন্ন তাদের অবয়ব। দুর্ভিক্ষের ছবি দিয়ে যে খড়ি হাতের আঙুল পেরিয়ে হৃদয়ে দাগ কেটেছিল, তার দাগ আর মিলাল না। (সোমনাথ, ১৯৯২ : ১৩)

সোমনাথ হোরের এই কথাগুলোই প্রমাণ করে যে তিনিও ছবি আঁকা শুরুর সময়ে '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের মতো একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদিও একটি আদর্শগত দিক থেকে তিনি এই ঘটনাকে দেখেন কিন্তু এই ঘটনা তাঁর সমগ্র শিল্পী জীবনে ছবি আঁকায়, ছবির বিষয় নির্বাচনে, আঙ্গিক নির্মাণে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। হোক তা স্বভাববাদী রীতি কিংবা নিরীক্ষাধর্মিতা। মানুষের অসহায় অবস্থা বা যন্ত্রণা থেকেই তিনি সৃষ্টির নতুনত্বে ভ্রমণ করেছেন।

সোমনাথ হোরের জন্ম চট্টগ্রামে। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৪৫ সালে। এর আগেই অবশ্য তাঁর ছবি আঁকা শুরু হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। একজন কমিউনিস্ট হিসেবেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন ব্রিটিশ শাসক ও দেশীয় শোষক-জোতদারদের ষড়যন্ত্রে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। (অশোক, ২০০৩ : ১১৭)। পার্টির নির্দেশে তিনি চট্টগ্রামে যান দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকার জন্য।

এ সময় তার সঙ্গে দেখা হয় চিত্তপ্রসাদের। চিত্তপ্রসাদের সংস্পর্শে এসে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন। সোমনাথ হোরের ভাষায় — 'তিনি (চিত্তপ্রসাদ) আমার প্রথম দীক্ষাগুরু। প্রায় হাতে ধরে ক্ষুধিতপীড়িত মুমূর্ষুদের অবয়ব আঁকায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। যখনই চট্টগ্রাম যেতেন, আমি তাঁর অবিরাম সঙ্গ পেতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ওঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতাম। রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় বসে দেখতাম সারাদিনের করা, পেনসিলের আঁকা স্কেচগুলিকে অবলীলায় চাইনিজ ইংকের কালি, তুলি দিয়ে ভরাট করে তুলেছেন, মনে পড়ে, তিনি বলছেন, 'সোমনাথ, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি, কী বড় বড় চোখ, কত চুল, কত দিন খেতে পায়নি, চোখগুলো কীরকম জ্বলজ্বল করছিল, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কণ্ঠা, বুকের পাঁজরা, আহ-রে, বেরিয়ে আসতে চাইছে...' আমি শুনে যেতাম। হু-হাঁ করতাম। বুঝতে পারতাম উনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। সমগ্র দৃশ্য মনের চোখে দেখছেন এবং ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন' (সোমনাথ, ২০১১ : ৮৫-৮৯)।

পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস ওয়ার'-এ ছাপা হয় সোমনাথের ছবি (অশোক, ২০০৩ : ১২০)। চিত্ররচনার আঙ্গিকগত দিকে দক্ষতা বৃদ্ধির আশায় তিনি ভর্তি হন

কলকাতা আর্ট স্কুলে। আর্ট স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পান জয়নুল আবেদিনের কাছে। তাঁর সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল একাডেমিক পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত হওয়া। এই সময় কিছু চীনা উডকাট প্রিন্টের নমুনা দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনি দ্বিতীয় বর্ষে গ্রাফিক বিভাগে যোগ দেন। উডকাটে আর্ট স্কুলে শিক্ষক হিসাবে পেলেন সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯২২-২০১২) কে (অশোক, ২০০৩ : ১২৭-১২৮)।

মন্বন্তর-উত্তর গ্রামবাংলার ভাগচাষিরা তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করলে ১৯৪৬ সালের ১৮ থেকে ২৮ ডিসেম্বর তিনি যান উত্তরবঙ্গে, রংপুরে পার্টির পক্ষ থেকে। এই দশদিনে তিনি যে স্কেচ করেছেন এবং ডায়েরি লিখেছেন তাতে ধরা পড়েছে কৃষকদের সংগ্রামী চেহারা (অশোক, ২০০৩ : ১২২)।

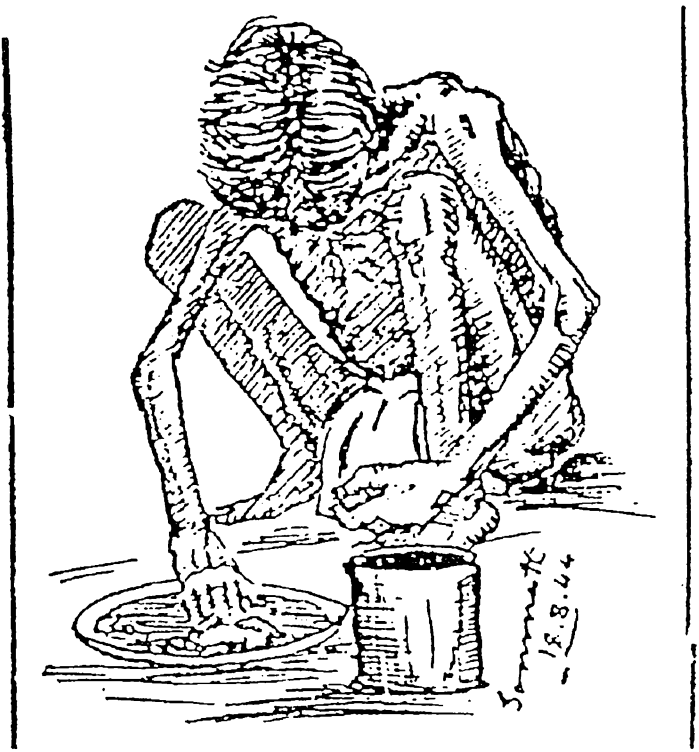

দুর্ভিক্ষের স্কেচ, সোমনাথ হোর, ১৯৪৪

১৯৫৬ সালে তিনি পার্টির কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন (সোমনাথ, ১৯৯২ : ৯)। ইতোমধ্যে তিনি তেভাগা, শিক্ষক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাংবাদিক ধর্মঘট, চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু কাঠ খোদাই করেন যা অনেকেরই নজর কাড়ে (শ্রীপান্থ, ১৯৯৪ : ২২)। এ কাজগুলো অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার

নিয়ম মেনে আলোছায়া বিভাজনের মাধ্যমে করা হয়েছে। কিন্তু সোমনাথের মনে অতৃপ্তি কাজ করছিল শিল্প নির্মাণ নিয়ে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'বিষয়কে শিল্পপ্রকরণের নানা আভরণে বিভূষিত করাই রসসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, বিষয়কে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সেটি সব সময় শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে হয় না' (সোমনাথ, ১৯৯২ : ১২)। তবে সোমনাথের পরবর্তী সময়ের শিল্পে প্রকরণ ও প্রকাশের নতুনত্ব ও প্রাণোন্মাদনা থাকলেও বিষয়কে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। দুর্ভিক্ষের ক্ষত তাঁকে অন্য ক্ষতির সঙ্গে একাত্ম হতে অনুপ্রাণিত করেছিল আর সে কারণে তাঁর কাজে নিরীক্ষাধর্মিতা এবং বিষয়ের নির্যাস দুটোই প্রবল।

বিশ্বভারতীর কলাভবনে গ্রাফিক বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালে তিনি একটি নতুন ছাপচিত্রমালা তৈরি করেন 'ক্ষত' নাম দিয়ে। তাঁর ভাষায়, '১৯৬৮/৬৯ থেকে সামজজীবনে এক ধরনের রাজনৈতিক, অস্থিরতার বিকাশ ঘটে। ... রাস্তায় চাকার গভীর দাগ, গাছে কুঠারের কোপ আর মানুষের দেহে অস্ত্রাঘাত সবই আমার চোখে ক্ষতরূপে দেখা দিল। এই ক্ষতচিন্তা থেকে আমার সাদার উপর সাদা কাজগুলির জন্ম। এগুলি আপাত বিমূর্ত; কিন্তু এগুলি তৈরি হয়েছে প্রকৃত ক্ষত যেভাবে তৈরি হয় সেভাবে। মাটির পাত কিংবা মোমের পাতে নানা অস্ত্রের সাহায্যে; কখনও আগুনে ঝলসে নিয়ে। পরে সিমেন্টের ছাঁচ তৈরি করে তা থেকে ছাপ নিয়েছি' (সোমনাথ, ১৯৯২ : ১৪-১৫)।

১৯৭০-এর দ্বিতীয় পাদে তিনি শুরু করছিলেন ব্রোঞ্জ ঢালাই করে ভাস্কর্য নির্মাণ । এ সময়ের কাজগুলো মানুষ এবং জন্তুর দেহনির্ভর। এ সময়েও ক্ষত-চিন্তা তাঁর কাজের মূলে সক্রিয় ছিল। দেহগুলো দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মতোই নিরন্ন। হাত, পা, মাথা এবং চামড়া শরীরের অস্তিত্ব জানান দিলেও বুক পেট পুরোটাই ফাঁকা।

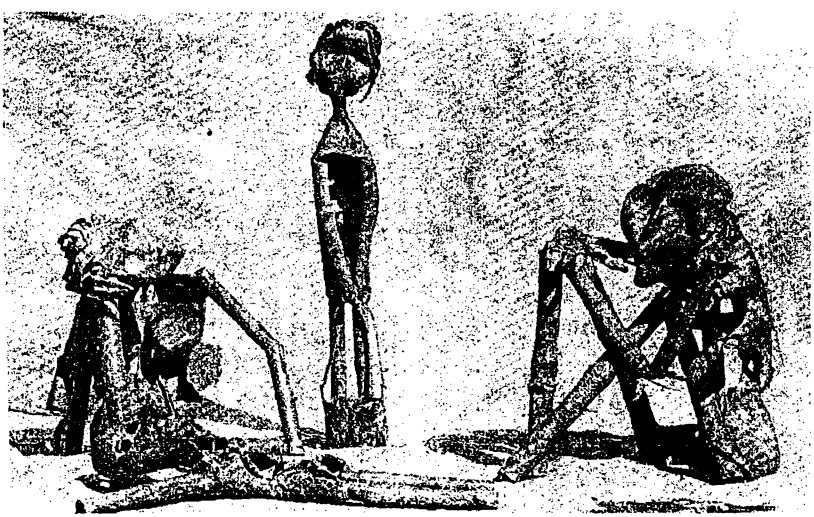

বুভুক্ষার ক্ষত, ধাতুভাস্কর্য, সোমনাথ হোর, ১৯৮৪(?)

পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে তাঁর করা নিরীক্ষামূলক ছাপাই ছবির মানুষ এবং জন্তুর দেহের উপস্থাপনাও অসহায়, নিরন্ন। ড্রইং-এও এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

বুভুক্ষু, এচিং, সোমনাথ হোর, ১৯৮৩

দুর্ভিক্ষের আর একজন উল্লেখযোগ্য চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ। জয়নুল আবেদিনের সমসাময়িক এবং সোমনাথ হোরের চেয়ে বয়সে বড় চিত্তপ্রসাদের জীবনাদর্শ আর শিল্পাদর্শ ছিল অভিন্ন। সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি দরদ থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ হলেও তাঁর নিজস্ব শিল্পীসত্তা ছিল। যে কারণে পার্টি ছেড়ে দেয়ার পরও তিনি ছবি এঁকেছেন নিজের মতো করে। চিত্তপ্রসাদের জন্ম নৈহাটিতে। বাবার চাকুরির সূত্রে তিনি অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। চিত্তপ্রসাদের মা ইন্দুমতী দেবী বাংলার লোককলা পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পথিকৃৎ গুরুসদয় দত্তের স্ত্রী সরোজনলিনী দেবীর মহিলা সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তিনি চিত্তপ্রসাদকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন ছবি আঁকার ক্ষেত্রে (অশোক, ২০০৩ : ৪৩)। ছবি আঁকায় চিত্তপ্রসাদের কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ১৯৪২-এর দ্বিতীয়ার্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন চিত্তপ্রসাদ (প্রকাশদাস, ২০১১ : ৩৪৮)। ১৯৪৩-৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র বাংলা 'জনযুদ্ধ' ও ইংরেজি 'পিপলস ওয়ার'-এ অসংখ্য ছবি ছাপা হয়েছে চিত্তপ্রসাদের, প্রধানত দুর্ভিক্ষের চিত্র (শ্রীপান্থ, ১৯৯৪ : ১৯)। ১৯৪৩-এ বন্যা আর দুর্ভিক্ষপীড়িত মেদিনীপুর জেলা ঘুরে রিপোর্ট লেখার জন্য পার্টির নির্দেশ পান চিত্তপ্রসাদ। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লেখা তাঁর ইংরেজি ডায়েরি 'হাংরি বেঙ্গল' ছবিসহ প্রকাশিত হওয়ার পরে সব কপি কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশ সরকার। বইটির দুএকটি কপি যা বেঁচে গিয়েছিল পরবর্তীকালে তা অনূদিত হয়ে 'ক্ষুধার্ত বাংলা' নামে বেরিয়েছিল। 'ক্ষুধার্ত বাংলা'র ছত্রে ছত্রে কেবল যে তখনকার মেদিনীপুরের পরিস্থিতিরই পরিচয় পাওয়া যায়, তাই না, সেই

সঙ্গে জানা যায় তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, রাজনৈতিক সচেতনতা আর মানবিক সংবেদনশীলতা (অশোক, ২০০৩ : ৪৬)।

দুর্ভিক্ষের স্কেচ, কালি-কলম, চিত্তপ্রসাদ, ১৯৪৪

চিত্তপ্রসাদের দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো রেখার বলিষ্ঠতায়, সাদাকালোর ভারসাম্য এবং সুষম বিন্যাসে অভিব্যক্তিপূর্ণ বাস্তববাদী চিত্রে পরিণত হয়েছে। এ স্কেচগুলোকে শুধু প্রতিবেদনমূলক ছবি বললে ভুল হবে। পরবর্তীকালে তাঁর করা লিনোকাটে ছাপাই ছবি এবং অন্যান্য মাধ্যমে করা ছবিগুলোও গুণগত মান বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ১৯৪৯ সালে চিত্তপ্রসাদ পার্টি ছেড়ে দেন। ১৯৫০ সালে শুরু হয় তাঁর শিল্পী জীবনের আর এক অধ্যায় (প্রকাশ, ২০১১ : ৩৫০)।

এরপর তিনি কালি-কলম-তুলির সঙ্গে আরো যোগ করলেন প্যাস্টেল, জলরং, তেল রং, স্ক্রাপার বোর্ড, লিনোলিয়াম, কাঠখোদাই, পুতুল নাচ, গ্রন্থচিত্র, মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চের পাত্র-পাত্রীদের অঙ্গসজ্জার মতো শিল্পের বিস্তৃত মাধ্যম (প্রকাশ, ২০১১ : ৩৫৪) চিত্তপ্রসাদ পার্টি ছেড়ে দিলেও তাঁর ছবির বিষয়ে পরিবর্তন খুব একটা হয়নি। সমাজের অসহায়, নিরন্ন নিম্নআয়ের, শ্রমজীবী, গ্রামীণ মানুষকে নিয়েই তিনি সারাজীবন ছবি এঁকেছেন। কাজেই দুর্ভিক্ষকে তিনি শুধু আদর্শগত দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেননি। তাঁর মধ্যে ছিল সাধারণ,

অসহায় মানুষের প্রতি দরদ, মমত্ববোধ। মানুষের প্রতি এই মমত্ববোধ তাঁকে ছবি আঁকতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

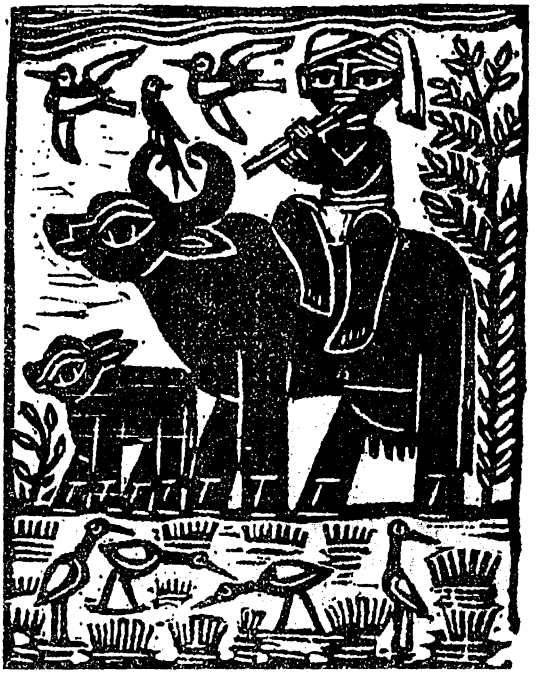

মহিষের পিঠে বালক, লিনোকাট, চিত্তপ্রসাদ

১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় সমাজে দারিদ্র শিশুদের অবস্থান নিয়ে ২২টি লিনোকাঠ করেন যার নামকারণ হয় 'Angels Without Fairy Tales' (রূপকথাহীন দেবদূতেরা) (প্রকাশ, ২০১১ : ৩৪৬)। ১৯৫৫ সালে তিনি লোকনৃত্য নিয়ে ২৪টি লিনোকাট করেন (প্রকাশ, ২০১১ : ৩৫৬)। এছাড়া চিত্তপ্রসাদ গ্রাম বাংলার নানা পেশার মানুষ যেমন, কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর এবং গ্রামীণ পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছাপাই ছবি করেছিলেন। তাঁর ছবিতে প্রকাশভঙ্গির সারল্য দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সাদা-কালোর সমতাপূর্ণ ব্যবহার, আকৃতিতে মোটা বন্ধনী রেখার সামঞ্জস্য রক্ষা চিত্তপ্রসাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরই পরিচয় বহন করে (বিজন ২০১১ : ২৪০)। মুম্বাইয়ের নিচুতলার বাসিন্দাদের যেমন মৎস্যজীবী, সবজিওয়ালা, কিশোর, কিশোরী, মজুর-মজুরানি এদের নিয়ে অনেক ছবি তিনি করেছেন। (সোমনাথ, ২০১১ : ৯০)। লোকসংস্কৃতির প্রভাব ছিল তাঁর ছাপাই ছবিতে। তাঁর 'পুতুল' ও 'পাপেট'-এর ছবিগুলিতে সেই পরিচয় স্পষ্ট (কমলকুমার, ২০১১ : ২১৭)। কাঠখোদাই ও লিনোকাট এই দুটি মাধ্যমেই চিত্তপ্রসাদ বেশি চর্চা করেছেন। এই দুটি মাধ্যমই রিলিফ প্রিন্ট বা নতোন্নত পদ্ধতির ছাপচিত্র। এখানে কাঠ বা লিনোলিয়ামের যে অংশ কেটে ফেলে খাঁজ তৈরি হয়, সেখানে রং লাগানো হয় না।

বর্ণলেপন করা হয় উন্নত অংশে, অর্থাৎ যে অংশ কাটা হয় না, সেখানে সাদা-কালো ছবিতে উন্নত অংশে কালো রং লাগিয়ে সেখান থেকে কালো ছাপ তোলা হয়। খোদিত অংশ কাগজের সাদা হিসেবে উদ্ভাসিত থাকে।

মা ও শিশু, লিনোকাট, চিত্তপ্রসাদ

সাদা-কালোর এই ঝকঝকে বৈপরীত্য উডকাট বা লিনোকাটের বৈশিষ্ট্য। লিনোলিয়াম অপেক্ষাকৃত নরম। সহজে কাটা যায়। তাই তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে। চিত্তপ্রসাদের ছবিতেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল (মৃণাল, ২০১১ : ২৭০)। চিত্তপ্রসাদের ছাপাই ছবির সৌন্দর্যের মূলে যে রহস্যটি ছিল তা উন্মোচন করেছেন প্রভাকর কোলতে। তিনি বলেছেন—

> তাঁর সময়ের একজন বিশিষ্ট 'মিনিমালিস্ট' ছিলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টির গভীর থেকে উৎসারিত একটি রেখা যথাযথ পরিমাণ কালি ভর্তি তুলির মুখে নির্দিষ্ট আকার নিত। চিত্র ক্ষেত্রের জমিকে বিভাজনের মধ্য দিয়ে তাকে আলো-ছায়ায় উন্নীত করতে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন তিনি। এই প্রাণসঞ্চারী বিভাজন ক্রিয়াই হল তাঁর সৃষ্টি রহস্যের প্রধান প্রবেশ পথ। আর এভাবেই ছাপগুণ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর ছবি। সেই সঙ্গে এক বিরল গুণের অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যান তিনি। (প্রভাকর, ২০১১ : ১৪৬)

এই প্রবন্ধে আলোচিত তিন শিল্পী ছাড়াও আরো অনেক শিল্পী দুর্ভিক্ষকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬), অতুল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০), সুধীর খাস্তগীর (১৯০৭-১৯৭৪), গোবর্ধন আশ (১৯০৭-২০০৭), পরিতোষ সেন (১৯১৮-২০০৮) প্রমুখ। এদের মধ্যে থেকে এই তিনজনকে নিয়ে

আলোচনার পেছনে কারণ হলো ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের একটি অমোচনীয় প্রভাব ছিল এই তিন শিল্পীর উপর। সাধারণ মানুষ, শহর অথবা গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ, সাধারণ মানুষের দুর্দশা- এ তিন শিল্পীর শিল্পের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁরা যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন তা শিল্পকলার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ছবিগুলো প্রমাণ করে যে, শিল্পকলা ইতিহাস বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। ইতিহাস শিল্প নির্মাণের উপর ক্রিয়া করে, প্রভাব বিস্তার করে, নতুন শিল্পভাষা নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জয়নুল আবেদিনের শিল্পীমানসে একটি বড় পরিবর্তন আনে দুর্ভিক্ষ। তাঁর শিল্পীজীবনের একটি সন্ধিক্ষণ রচনা করে দুর্ভিক্ষের চিত্র। সোমনাথ হোরের পুরো শিল্পীজীবনকে প্রভাবিত করেছে দুর্ভিক্ষের ক্ষত। আর চিত্তপ্রসাদের মানবিকতার প্রকাশ দুর্ভিক্ষ দিয়ে শুরু হয়ে চলেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। পরিশেষে বলা যায়, '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ এ তিন শিল্পীকে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংকট খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল এবং এই দেখা তাঁদের দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করেছিল শিল্পের মাধ্যমে সাধারণের অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনে।

গ্রন্থপঞ্জি

অশোক ভট্টাচার্য, ২০০৩। *কালচেতনার শিল্পী*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা।

কমলকুমার মজুমদার, ২০১১। "চিত্তপ্রসাদের লিনোকাট", *চিত্তপ্রসাদ*, (সম্পাদনা : প্রকাশ দাস), গাঙচিল, কলকাতা।

প্রভাকর কোলতে, ২০১১। "চিত্তপ্রসাদ : কালো-সাদায় নিহিত একটি সত্য", *চিত্তপ্রসাদ*, (সম্পাদনা : প্রকাশ দাস), গাঙচিল, কলকাতা।

প্রকাশ দাস, ২০১১। *চিত্তপ্রসাদ*, (সম্পাদনা : প্রকাশ দাস) গাঙচিল, কলকাতা।

বিজন চৌধুরী, ২০১১। "চিত্তপ্রসাদের চিত্রকলা", *চিত্তপ্রসাদ*, (সম্পাদনা : প্রকাশ দাস), গাঙচিল, কলকাতা।

মৃণাল ঘোষ, ২০১১। "ভারতের আধুনিক শিল্প-ইতিহাস ও চিত্তপ্রসাদ", *চিত্তপ্রসাদ*, (সম্পাদনা : প্রকাশ দাস) গাঙচিল, কলকাতা।

নিসার হোসেন, ২০০৭। *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষণমালা-৮, চারু ও কারু কলা*, (সম্পদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

নীতিশ সেনগুপ্ত, ২০০৮। *বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শ্রীপান্থ, ১৯৯৪। *দায়*, পুনশ্চ, কলকাতা।

শোভন সোম, ১৪০২। "জয়নুল আবেদিন", *নিরন্তর*, চতুর্থ সংখ্যা, বর্ষা সংকলন, ঢাকা।

শোভন সোম, ১৯৯৮। *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নিউ দিল্লি।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০০৪। *নিসর্গ ও মানবের গাথা, জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন*, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

সোমনাথ হোর, ১৯৯২। *আমার চিত্রভাবনা*, সীগাল বুকস, কলিকাতা।

সোমনাথ হোর, ২০১১। "চিত্তপ্রসাদ", *চিত্তপ্রসাদ*, (সম্পাদনা : প্রকাশ দাস), গাঙচিল, কলকাতা।

T. J. Clark. 1982. *Image of the People, Gustave Courbet and the 1848 Revolution*. Thames and Hudson, London.